# গণসংহতি আন্দোলনের নির্বাচনী ইশতেহার

প্রিয় নাগরিকবৃন্দ,

বাংলাদেশ আজ একটা সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। যে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের কথা বলবার, অধিকার প্রয়োগ করবার প্রধানতম হাতিয়ার হলো ভোট। বাংলাদেশের মানুষ বহু বছর ধরে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে একদিকে দেশবাসীর মুখবন্ধ, হাত-পা বাঁধা। অন্যদিকে নিরুপায় হয়ে দেখতে হয়েছে অকল্পনীয় নজিরবিহীন লুণ্ঠনের কাল, বেকারত্ব আর হতাশার একটি পর্ব। সর্বোপরি আতঙ্ক আর গুম-খুন-নির্যাতনের মাধ্যমে একটা ত্রাসের রাজত্ব। সামনের নির্বাচন তাই বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য, বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

ইতিহাসে বারবার প্রমাণিত হয়েছে, বাংলার মানুষ যদি জেগে ওঠে, কোন চক্রান্তকারী-দুর্নীতিবাজ-লুটেরা-স্বৈরশাসক-গুণ্ডাতন্ত্র-বিদেশি শক্তি এদেশের মানুষকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি। আমরা তাই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বাংলাদেশের মানুষের প্রতি আহ্বান জানাই, ৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮ সারাদিন ভোট কেন্দ্র থাকুন, নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করুন এবং অধিকার রক্ষার জন্য ফলাফল ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত ভোটকেন্দ্র পাহারা দিন।

গণসংহতি আন্দোলন এই নির্বাচনে ৩ জন প্রার্থী প্রদান করেছে। ঢাকা-১২ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি। যিনি গত ২৮ বছর যাবৎ জনগণের স্বার্থে, জাতীয় স্বার্থে প্রতিটি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন ও আছেন। আন্দোলন সংগ্রাম ও গণমাধ্যমে ন্যায়ের পক্ষে, জনগণের পক্ষে তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি, প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর পরিবর্তনকামী মানুষকে স্বপ্ন দেখায়। চট্টগ্রাম-১০ আসনে গণসংহতি আন্দোলনের প্রার্থী গণসংহতি আন্দোলনের রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য হাসান মারুফ রুমি। তিনি চট্টগ্রামের প্রতিটি রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে এক পরিচিত নাম। কিছুদিন আগে চট্টগ্রামে হোল্ডিং ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন, চিকিৎসার অধিকার আন্দোলনের অন্যতম নেতা। পাবনা-১ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গণসংহতি আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জুলহাসনাইন বাবু। তিনি পাবনা বেড়ায় তাঁত শ্রমিকদের আন্দোলন, চাতাল শ্রমিকদের আন্দোলন, জেলেদের মুক্ত জলাশয় আন্দোলনের সক্রিয় নেতা ও সংগঠক।

গণসংহতি আন্দোলনে প্রার্থীদের প্রতীক কোদাল।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণসংহতি আন্দোলন অংশগ্রহণ করছে দুইটি সুস্পষ্ট ঘোষণা ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

১. ভয়মুক্ত বাংলাদেশ: কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য

এবং

২. সকলের জন্য উন্নয়নের মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

গণসংহতি আন্দোলন এই নির্বাচনে তিনটি আসনে নির্বাচন করছে, ফলে সরকার গঠন করে এই ইশতেহার বাস্তবায়নের বাস্তব সুযোগ নাই। কিন্তু আমরা মনে করি এটা এই মুহূর্তেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং বাংলাদেশের স্বার্থে এর বাস্তবায়ন দরকার। একই সাথে এই ইশতেহার হলো ভবিষ্যতে আমরা যে বাংলাদেশ চাই তার রূপরেখা। বাংলাদেশের মানুষ তাদের সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় যে ধরনের পরিবর্তনের প্রত্যাশা করেছেন তার একটা প্রতিফলন। আমাদের সমস্ত প্রার্থীই এই ইশতেহারকে তাদের জন্য দিশা হিসাবে নিয়ে নির্বাচিত হলে সংসদে সোচ্চার থাকবেন, এমনকি নির্বাচিত না হলেও জনগণের সংগ্রামে তাকে জাগরুক রাখবেন। কারণ আমরা মনে করি, এই পথই বাংলাদেশের পথ, এদেশের সংগ্রামী জনগণের লড়াইয়ের সর্বোচ্চ প্রকাশ মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা।

কেবল এই পথেই একটা জনগণের বাংলাদেশ, ভয়মুক্ত গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, সবাইকে নিয়ে একটা সমৃদ্ধির বাংলাদেশ গঠন সম্ভব। এই লক্ষ্য পূরণে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, এবার আমরা ৩টি আসনে নির্বাচন করছি; পর্যায়ক্রমে জনগণের ভেতর ভিত্তি নির্মাণ করে ভবিষ্যতে ৩০০ আসনেই আমাদের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

ভয়মুক্ত বাংলাদেশ: একটা কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য

বাংলাদেশে আজ এক ভয়ের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। দরিদ্র-ধনী-মধ্যবিত্ত নির্বিশেষে সকলেই মনে করছেন তাদের কথা বলার স্বাধীনতা নেই। গুম-খুন-নির্যাতন-হামলা-গায়েবী মামলা প্রতিটা নাগরিকের হাত-পা যেন শেকলে বেঁধে রেখেছে। ব্যক্তিগত কোন অধিকর ক্ষমতাবান কেউ কেড়ে নিলেও কিংবা চোখের সামনে রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পদের গুরুতর ক্ষতিসাধন করলেও চুপ থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত লুণ্ঠিত হচ্ছে নাগরিকের সম্মান, আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা। তাই আমাদের প্রথম অঙ্গীকার হলো একটা ভয়মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি নাগরিক যেন ভয়মুক্তভাবে নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতে পারেন, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হবে রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য। আমরা মনে করি এই ভয়ের রাজত্ব টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে একটা স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকাঠামোর ওপর ভিত্তি করে। ফলে ভয়মুক্ত দেশ গঠনে প্রয়োজন ভয়ের উৎস এই শাসনকাঠামো বদল করে তাকে একটা গণতান্ত্রিক ভিত্তি দেওয়া।

বাংলাদেশে যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন হয় তারা শুধু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারই অধিকারী হয় না, বরং সর্বব্যাপী ক্ষমতা লাভ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, হাট, মাঠ, ঘাট, মসজিদ, মন্দির, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবীদের প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা, গণমাধ্যমসহ সর্বত্রই তাদের নিয়ন্ত্রণ, কর্তৃত্ব ও দখল কায়েম হয়। তাদেরই হাতে আসে বলপ্রয়োগের একচেটিয়া কর্তৃত্ব। অন্যদিকে যে ক্ষমতায় নেই, কার্যত সে নাগরিক অধিকারহীনে পরিণত হয়। তার জীবন-সম্পদ-সম্মান সবই ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছাধীনে চলে আসে। ক্ষমতায় থাকার অর্থ হয় সব পাওয়া আর ক্ষমতা হারানোর অর্থ দাঁড়ায় সব হারানো। ফলে ক্ষমতার জন্য এমন এক মরিয়াপনা তৈরি হয়, যাতে ক্ষমতায় গেলে তা রক্ষার জন্য ক্ষমতাসীনরা বেপরোয়া কাজকর্ম করতে থাকে, অন্যপক্ষও ক্ষমতায় পুনরায় আসীন হবার জন্য মরিয়া হয়ে যায়। এটা মূলত একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না হয়ে যে এককেন্দ্রিক ক্ষমতাকাঠামো তৈরি হয়েছে, তারই ফলে সৃষ্ট। বারবারই যার প্রকাশ ঘটেছে নির্বাচন ও ক্ষমতা বদলকে কেন্দ্র করে।

এরকম একটা অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিবাদমান দলগুলোর মধ্যে তৈরি হয় গভীর অনাস্থা ও বিভাজন। সমাজেও তার গভীর ছাপ পড়ে। রাজনৈতিক ভিন্নমত সব সমাজেই থাকে। কিন্তু পুলিশ-আদালত-নির্বাচন কমিশনের মতো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়িত্ব হলো নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা। সরকারের দায়িত্ব হলো রাষ্ট্র পরিচালনা। এখানে সরকার ও রাষ্ট্র একাকার হয়ে পড়েছে। লক্ষ্যণীয়, সরকার এমনকি তার দলের লোক এবং সমর্থকদেরও ভয় দেখাচ্ছে যে, ক্ষমতা হারালে লাখ লাখ লোক মারা যাবে, যেন প্রাণের ভয়ে হলেও যাতে তারা এই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে বিরোধী বিএনপি জোটও আগামী নির্বাচনকে দেখছে তাদের অস্তিত্বের সংকট হিসাবে। জিতলে সব পাওয়া অথবা হারলে সব হারানোর যে অবস্থা, তা একটা গোত্রীয় সংঘাতের সাথেই তুলনীয়, কোন গণতান্ত্রিক শাসনে প্রতিন্দন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই প্রক্রিয়ায় চলতে পারে না।

একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি বাংলাদেশকে কেবল জাতীয় নয়, বরং একটা আন্তর্জাতিক সংকটের ভেতরেও ফেলে দিচ্ছে। জাতীয় স্বার্থে ঐক্য দূরে থাক, বড় দুই গোষ্ঠী এমনকি নিজেদের জয়ের চাইতেও প্রতিপক্ষের নির্মূলে বেশি আগ্রহী। ফলে যেকোন আন্তর্জাতিক চাপ মোকাবেলায় বা অন্য দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নীতি নির্ধারণ করতে পারছে না। বরং গোষ্ঠীস্বার্থই প্রাধান্য পাচ্ছে।

এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দেশ, দেশের জনগণ। দেশের স্বার্থ উপেক্ষা করে ক্ষমতায় টিকে থাকার স্বার্থে বরং বিদেশিদের চাহিদা পূরণই সরকারগুলোর প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর বিপরীতে দরকার একটা অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতাহীন হওয়া মানেই নাগরিক অধিকারহীন হওয়া নয়। যেখানে সরকারের বিরোধিতাকে দেশদ্রোহিতা হিসাবে বিবেচনা না করে বরং গণতান্ত্রিক ভিন্নমত হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং সরকার ও বিরোধী উভয়েই জাতীয় স্বার্থকেই সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেবে গোষ্ঠী বা দলীয় স্বার্থের চাইতে। সেরকম ব্যবস্থা ছাড়া আমরা কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকারকে পূরণ করতে পারব না। কাজেই জাতীয় স্বার্থে এই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

মানুষের মধ্যে আজকে যে ভয়ের রাজত্ব কায়েম হয়ে আছে তাকে দূর করে একটি ভয়মুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় যেসব আশু পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি সেগুলো হলো:

১.১.১ প্রতিটি মানুষের জীবন, সম্পদ ও মর্যাদার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমষ্টির ক্ষতি না করে মানুষ যেন মুক্তভাবে কথা বলতে পারে, রাজনীতি করতে পারে, সংগঠন করতে পারে, নিজের মত প্রকাশ করতে পারে, সেই অধিকার নিশ্চিত করা হবে। বাক স্বাধীনতা রক্ষায় দেশের সংবিধান ও অন্যান্য আইনে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হবে।

১.১.২. গুম-খুন-নিপীড়নের প্রতিটি ঘটনার গ্রহণযোগ্য তদন্ত এবং প্রতিটি ঘটনায় বাস্তবে যা ঘটেছিল তার উদঘাটন, হুকুমদাতাদের চিহ্নিতকরণ এবং শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি নিপীড়নের ঘটনায় রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, যথাসম্ভব ক্ষতিপূরণের বন্দোবস্ত করবে। আটক করে, জেলখানায় বা রিমান্ডে, বা গোপনে শারিরীক নির্যাতন আইন করে নিষিদ্ধ করা হবে এবং এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১.১.৩. পুলিশসহ সকল আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যক্রম তদারকিতে নাগরিকদের নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হবে যারা তাদের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ না করে তাদের বিষয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং জনগণের জবাবদিহিতার আওতায় আনবে।

১.১.৪. আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তাদের কাজ স্বাধীনভাবে করতে দেয়া হবে, তাদেরকে রাজনৈতিক ক্ষমতার দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হবে। জবাবদিহিতার আওতায় আনা হলেও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তারা যেন ক্ষমতাবানদের বেআইনি হুকুম পালনে বাধ্য না হন, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে।

১.১.৫. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। আইনী হয়রানির প্রধান হাতিয়ার নিম্ন আদালতকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ থেকে পূর্ণভাবে মুক্ত করে বিচার বিভাগের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিয়োগে নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্বের অবসান ঘটিয়ে আদালতকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত করা হবে।

১.১.৬. দুর্নীতি দমন কমিশন, মানবাধিকার কমিশনকে সরকারি কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত করা হবে। তাদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে যে কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে কাজ করার এখতিয়ার প্রদান করা হবে। তথ্য কমিশনকে আরও সক্রিয় ও হয়রানি মুক্ত করা হবে, সর্বোচ্চ এক সপ্তাহের মাঝে তথ্যপ্রদানে বাধ্যবাধকতার আইন প্রণয়ন করা হবে।

১.১.৭. নাগরিকদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষায় রাষ্ট্র পদক্ষেপ নেবে। আদালতের অনুমতিতে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিত কারও ব্যক্তিগত ফোনালাপ রেকর্ড ও প্রচার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ মানুষের মত-প্রকাশের স্বাধীনতা হরণকারী সকল আইন বাতিল করা হবে।

নতুন একটি জাতীয় সনদ: স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জাতীয় ঐক্য

ভয়ের রাজত্বের আসল উৎস রাজনৈতিক এবং একটা সাংবিধানিক কাঠামোগত স্বৈরতন্ত্র। আমরা আগেই বলেছি এই স্বৈরতন্ত্রই বর্তমান বাংলাদেশে একটা মল্লযুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। তাই ভয়ের রাজত্বের স্থায়ী ও কার্যকর অবসানের লক্ষ্যে একটা নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক চুক্তির ভিত্তিতে একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমে একটা নতুন জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দিচ্ছে গণসংহতি আন্দোলন।

১.২ স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামো, বিচার বিভাগ ও শাসন ব্যবস্থার সংস্কার:

১.২.১. এককেন্দ্রিক ক্ষমতার অন্যতম উৎস সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করে জনগণের প্রতিনিধিদের স্বাধীন মত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১.২.২. বাংলাদেশের বর্তমান এককেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো বদল করে ক্ষমতার ভারসাম্য ও পৃথকীকরণ নিশ্চিত করতে সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদের সংস্কার করে নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হবে। সকল নাগরিকের নাগরিক মর্যাদা, মত প্রকাশের অধিকার, জীবন-জীবিকার অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি এর সাথে সাংঘর্ষিক সমস্ত আইন-কানুন, বিশেষ আদেশ ইত্যাদি বাতিল করা হবে।

১.২.৩. সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি করা হবে।

১.২.৪. সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান যেমন নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন ইত্যাদিতে সাংবিধানিক কমিশন কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা করা ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে নিজস্ব বাজেট প্রণয়নের ক্ষমতা ও জনবল তৈরির আইনী বিধান তৈরি করা হবে।

১.২.৫. বিচার বিভাগকে খবরদারিমুক্ত প্রকৃত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল কার্যকর করা হবে। আলাদা সুপ্রিম কোর্ট কার্যালয় স্থাপন এবং নিম্ন আদালতের ওপর সুপ্রিম কোর্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। বিচার বিভাগের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ থাকবে।

১.২.৬. সংসদ নির্বাচনের বিদ্যমান পদ্ধতি পরিবর্তন করে জনগণের সর্বস্তরের অধিকতর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতি চালু করা হবে। গণবিরোধী বা দুর্নীতি ও নিপীড়নের সাথে যুক্ত হলে নির্বাচিত সদস্যদের প্রত্যাহারের বিধান তৈরি করা হবে।

১.২.৭. দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট সংসদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উভয় কক্ষের মধ্যে পরস্পরমুখি জবাবদিহিতার মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের প্রধান প্রধানমন্ত্রীর কর্তৃত্বের ভারসাম্য নিশ্চিত করা হবে।

১.২.৮. কেন্দ্রমুখী, আমলাতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার অবসান করে শক্তিশালী ও খবরদারিমুক্ত স্থানীয় সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। তাদের পরিকল্পনা তৈরি, বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হবে।

১.২. ৯ আরপিও সংশোধন করে রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের অগণতান্ত্রিক ধারা বাতিল, স্বতন্ত্র প্রার্থীতাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করে গণতান্ত্রিক আরপিও তৈরি করা হবে।

১.২.১০. সংবিধানের মৌলিক সংশোধন করতে হলে গণভোটের মাধ্যমে জনগণের প্রত্যক্ষ মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে।

১.২.১১ সকল ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা, উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড আইনি, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবেলা করা হবে।

১.২.১২ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের উত্থানের বিরুদ্ধে জামায়াতসহ যেসব দল রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে সক্রিয় ছিল তাদের রাজনৈতিক অধিকার বন্ধে আইন প্রণয়ন করা হবে।

১.২.১৩ দেশে গণতান্ত্রিক ও সহনশীলতার সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা করা হবে। পার্থক্যকে বিভক্তি নয় বরং বৈচিত্র্য আকারে চর্চা করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে এবিষয়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। হিংসা, হানাহানি, বিভক্তি, বিভাজন বর্জন করে একটা সত্যিকার অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ঐক্যমতে পৌঁছতে হবে।

১.২.১৪ আমরা মনে করি, সাংবিধানিক ক্ষমতা কাঠামো ও শাসনব্যবস্থার উল্লিখিত সংস্কার এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হলে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্রক্ষমতার এমন জবাবদিহিতা ও ভারসাম্য তৈরি হবে যাতে নির্বাচনের সময়ে দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকলেও নির্বাচন কমিশনের নেতৃত্বেই অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাস্তবতা তৈরি হবে। তবে দীর্ঘদিনের ক্ষমতার একচেটিয়াকরণের তৎপরতা যে বিভাজন ও অনাস্থা তৈরি করেছে, তাতে দলীয় সরকারের অধীনে আস্থাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি হতে কিছুটা সময় লাগবে। সে কারণে অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের আস্থাপূর্ণ পরিবেশ তৈরির জন্য অন্তত ৩টি জাতীয় নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচনকালীন সরকার গঠন করতে হবে। এ বিষয়ে সরকার ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতীয় অঙ্গীকার তৈরি করতে হবে।

কিন্তু কেবল এসব কাঠামোগত সংস্কারই একটা স্থায়ী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট নয়। দরকার যে লুণ্ঠনমূলক অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর এই স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থার সৌধটি তৈরি হয়েছে তারও আমূল সংস্কার। এই ব্যবস্থার উপযোগী করে দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির রূপান্তর। নারীর মর্যাদা, পরিবেশের সুরক্ষা, দেশের তরুণ শক্তির সৃজনশীল বিকাশ, নানা কারণে পিছিয়ে পড়া সমস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো নির্মাণসহ এক বিপুল আয়োজন। সেজন্য বর্তমান উন্নয়ন দর্শনের বদল দরকার। দরকার জনগণের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য জনগণের অংশগ্রহণে এক নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলার কর্মসূচি।

## সকলের জন্য উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ

বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে বিপুল উন্নয়নের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে তার ডামাডোল বাজছে জনগণের অর্থ খরচ করেই। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার জীবন দিয়ে টের পাচ্ছেন বেকারত্ব, আয়ের সাথে ব্যয়ের বিপুল ফারাক আর প্রতিদিনের অনিশ্চয়তার জ্বালা। অবকাঠামো উন্নয়নের নামে বিপুল ব্যয় হয়েছে, কিন্তু ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, হাসপাতালে চিকিৎসার দশা, শিক্ষার ধ্বংসপ্রাপ্তি বুঝিয়ে দিচ্ছে দুর্নীতির মাত্রা। বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী আলোচিত ব্যাঙ্ক লুটপাট, টাকা পাচার আর নানান সব অনিয়মের জন্য। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে কলে-কারখানায়, পোশাক শিল্পে যে সম্পদ তৈরি করেন, প্রবাসী বাংলাদেশী নাগরিকরা রক্তঘাম করা যে অর্থ দেশে প্রেরণ করেন, তাই সরকার ব্যয় করেছে লুণ্ঠন ও পাচারে। এরই নাম দেয়া হয়েছে উন্নয়ন, এভাবে তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আজ ধ্বংসের দোড়গোড়ায় নিয়ে এসেছে। নতুন শিল্পকারখানা স্থাপন বন্ধ রয়েছে, বন্ধ রয়েছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগ। উদ্যোক্তারা আতঙ্কে রয়েছেন, বেকারত্ব অতীতের সকল নজির ভঙ্গ করেছে।

বাংলাদেশে একটি উৎপাদনশীল অর্থনীতি চালু করতে ও সামাজিক, সাংস্কৃতিক রূপান্তরের জন্য আমাদের প্রস্তাব:

২.১.১ উদ্যোক্তারা অর্থনীতিতে এই পর্বে প্রধান গুরুত্ব পাবেন। একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন করে দেশে তৈরি করা সম্ভব এমন সকল পণ্যের তালিকা তৈরি করে আশু, মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদে সেগুলো উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে। উদ্যোক্তারা বাজারের নিশ্চয়তা পাবেন, প্রয়োজনীয় ঋণ সুবিধা পাবেন এবং তাদের প্রতি প্রতিবন্ধক এমন সকল শুল্ক অপসারণ করা হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি

শিল্পোদ্যোক্তারা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যেন ভূমিকা রাখতে পারেন, তা নিশ্চিত করা হবে। ইলেক্ট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি এবং কৃষি প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যন্ত্রাংশ উৎপাদনে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত অন্যান্য দেশের নাগরিকদের উৎপাদনশীল খাতে সহজ শর্তে দেশে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়া হবে। বাংলাদেশের চারু ও কারুশিল্পকে বিশ্বের দরবারে পরিচিত ও জনপ্রিয় করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে।

২.২.১ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিন স্তম্ভ কৃষক, প্রবাসী শ্রমিক ও পোষাক শ্রমিকদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। কৃষিপণ্যের ন্যূনতম দাম নির্ধারণ করে এবং মধ্যস্বত্তভোগীদের লাগামহীন মুনাফাকে সীমিত করে জাতীয় অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করা হবে। পোষাক শ্রমিকসহ রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের নিরাপদ কর্ম পরিবেশ, ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও বাঁচার মতো মজুরি নিশ্চিত করা হবে। যার ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও অন্যান্য শিল্প বিকাশের পথ তৈরি হবে। প্রবাসী শ্রমিকদের দেশে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে যথাযথ পরামর্শ ও সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে। বিদেশে কর্মরত শ্রমিকরা যাতে হয়রানি, নিপীড়নের শিকার না হন তার জন্য বাংলাদেশের প্রতিটি দূতাবাসকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। বিদেশগামী শ্রমিকদের ভাষাগত ও কারিগরী প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ শ্রমিক হিসাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। বেসরকারি চাকুরীজীবীদের চাকরির নিরাপত্তা ও সুযোগসুবিধা প্রদানে 'বেসরকারি চাকুরিজীবী নীতিমালা' প্রণয়ন করা হবে।

২.২.২ জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ১৬ হাজার টাকা ঘোষণা করা হবে এবং সর্বত্রই তা বাস্তবায়ন করা হবে।

২. ৩.১ শিক্ষাখাতে জিডিপির অন্তত ৬% বরাদ্দ করে শিক্ষার আমূল সংস্কার করা হবে।

২.৩.২ জাতীয় ভিত্তিতে শিশুদের সংখ্যা নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। প্রাথমিক পর্যায় থেকে শিক্ষকদের বেতন সরকারি কর্মকর্তাদের সমান নির্ধারণ, তাদের সামাজিক মর্যাদার উত্তরণ নিশ্চিত করণ এবং শ্রেষ্ঠ মানের ছেলেমেয়েরা যেন যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষকতায় আসে, তা সুনিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ নেয়া হবে। যে কোন যোগ্য শিশু যেন শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পৌঁছুতে পারে, তার সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। শিশুরা যেন জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি মানুষ, প্রকৃতি, পশুপাখি, দেশ ও সমাজের প্রতি ভালোবাসা ও সহিষ্ণুতা নিয়ে ভবিষ্যতের নাগরিক হিসেবে যোগ্যভাবে বিকশিত হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

২. ৩.২ পাঠ্যসূচিতে আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে জ্ঞান ও সৃজনশীলতা বিকাশের উপযোগী পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাপদ্ধতি তৈরি করা হবে। উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের সাথে সম্পর্কিত শিক্ষার প্রবর্তন করা হবে।

২. ৩.৩ শিক্ষার যুগোপযোগী রূপান্তরের জন্য শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের নিয়ে জাতীয় একটি পরিষদ গঠন যারা আশু, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন। তা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল বরাদ্দে রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে, এমন আইন প্রবর্তন করা হবে।

২. ৩.৪ শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া পিএসসি, জেএসসি পরীক্ষা বাতিল করা হবে। শ্রেণী মূল্যায়নে বিশেষ জোর দেওয়া হবে ও শিক্ষার্থী কর্তৃক শিক্ষক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা হবে। সকল বিদ্যালয়ে সক্রিয় লাইব্রেরি বাধ্যতামূলক করা, সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চালু করা হবে। শিক্ষার্থীদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

২.৩.৫ দারিদ্র্য বা অন্য কোন কারণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি বৃত্তির ব্যবস্থা করা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে এই কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা হবে।

২.৩.৬ মাতৃভাষায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত সকল প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি অনুবাদে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আদিবাসীদের জন্য নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২.৪.১ একদিকে বিপুল ব্যয় সত্ত্বেও সেবার গুনগত মানের কোন নিশ্চয়তা না থাকা বেসরকারি চিকিৎসা ও অন্যদিকে দুর্নীতি, অপচয়, অব্যবস্থাপনায় ডুবে থাকা সরকারি চিকিৎসা খাতকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে। বাজেটে এ জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা নিরূপণ করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসূচি নেওয়া হবে।

২.৪.২ চিকিৎসা সেবার মান তদারকির জন্য একটি কার্যকর সংসদীয় তদারকি সংস্থা গড়ে তোলা হবে। যেখানে চিকিৎসকদের পাশাপাশি অন্যান্য পেশার ব্যক্তিবর্গও থাকবেন। এটি সরকারি ও বেসরকরী উভয়খাতে সেবার মান যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে কি না, চিকিৎসকরা দায়িত্ব পালন করছেন কি না, তা তদারক করবে এবং সেবার মান আরও উন্নত করতে কী কী করণীয়, সে বিষয়ে অবশ্যপালনীয় নীতিমালা নির্ধারণ করবে।

২.৪.৩ সরকারি চিকিৎসাব্যবস্থাকে উন্নততর করা হবে, প্রতিটি রোগী যেন প্রয়োজনীয় সময় ও মনোযোগ চিকিৎসকের কাছ থেকে পান, তা নিশ্চিত করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ বেতন ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করে সরকারি বেতন ভুক্ত চিকিৎসকরা যেন তাদের পুরো কর্মসময় দায়িত্বে যুক্ত থাকেন, তা নিশ্চিত করা হবে।

২.৪.৪ জেলা পর্যায়ে বিশেষায়িত হাসপাতাল ও উপযুক্ত পদ সৃষ্টি ও নিয়োগদানের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে যেন অসুস্থতার কারণে কাউকে রাজধানীতে ছুটতে না হয়। কিডনি ডায়ালাইসিসের মতো আরও কিছু প্রাণঘাতী, ব্যয়বহুল অথচ রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে সুলভে প্রদান করা সম্ভব এমন সকল অসুখের জন্যও জেলা পর্যায়ে ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হবে।

২.৪.৫ দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার ওপর নাগরিকদের আস্থা সৃষ্টি করতে হবে। চিকিৎসকদের জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে। প্রবাসী গুণী চিকিৎসকদের দেশে আসার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। ৫ বছরের মধ্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির আধুনিকতম প্রশিক্ষণে সমৃদ্ধ একটি কার্যকর চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করা হবে। দেশে প্রাপ্য চিকিৎসার মান সন্তোষজনক করাকে সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিবর্গ দেশে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন। দেশে যেসব রোগের চিকিৎসা সম্ভব সেসব চিকিৎসা কোন সরকারি কর্মকর্তা কিংবা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বাইরে করাতে চাইলে তার ওপর বিশেষ কর আরোপ করা হবে।

২.৪.৬ বাংলাদেশে মাথাপিছু চিকিৎসকদের সংখ্যা পৃথিবীর মাঝে কমগুলোর একটি, আরও কম নার্স, মেডিকেল অ্যাসিসট্যান্ট, চিকিৎসা-প্রযুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ জনশক্তি। এগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি করা এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত পদ সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২.৪.৭ ওষুধের দাম কমানোর জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হবে। ওষুধ শিল্পের বিকাশে গবেষণা ও উদ্ভাবনকে গুরুত্ব দেয়া হবে।

২.৫.১ অর্থনীতিতে সুশাসন কায়েম ছাড়া কোন দেশে সমৃদ্ধি আসতে পারে না। স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি এবং অবৈধ অর্থের মালিকরা যেন অর্থনীতির দখল নিয়ে তাকে ধ্বংস করতে না পারে, অন্যদিকে সৎ-যোগ্য উদ্যোক্তারা যেন চাপের মধ্যে না পড়েন, সেজন্য বিশেষ আদালত গঠন করে বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে লাখো লাখো তরুণকে সর্বস্বান্ত করার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও বিচারের আওতায় নিয়ে আনা হবে।

২.৫.২ ব্যাঙ্ক খাতে বিপুল পরিমাণ দুর্নীতি ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে খাদের কিনারে নিয়ে আসার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত ও বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাঙ্কের মালিকানায় পরিবারতন্ত্র ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান ঘটানো হবে। ব্যাঙ্ক ঋণের সুদের হার উৎপাদনশীল পুঁজির বিকাশের উপযোগী করা হবে।

২.৫.৩ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে লুণ্ঠন ও অপচয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা হবে। বিদ্যুতখাতে দায়মুক্তি আইন বাতিল করা হবে।

২.৫.৪ অবকাঠামো খাতে বিপুল দুর্নীতির মাধ্যমে জনগনের অর্থ লোপাটকারীদের বিচারের আওতায় আনা হবে। এসব বিচার করার বেলায়, একদিকে যেন তা প্রতিহিংসামূলক না হয়, সেটা নিশ্চিত করা হবে। অন্যদিকে যে দুর্নীতিমূলক কাঠামো ও জবাবদিহিতাহীনতার কারণে বারংবার রাষ্ট্রবিরোধী এই সব ঘটনা ঘটতে পারে, তার হাত থেকে স্থায়ী ভাবে দেশকে মুক্ত করা হবে।

২.৬.১ কম খরচে করার যুক্তি দিয়ে একই রাস্তা বার বার না করে অন্তঃত ২০ বছর মেয়াদি টেকসই রাস্তা নির্মান করা এবং সেখানে যান চলাচল ও ভারবহন ক্ষমতা বৃদ্ধির আগাম অনুমান করে সেভাবে রাস্তার কারিগরি মডেল তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২.৬.২ রেলকে প্রধান যানবাহন হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে গণপরিবহন পরিকল্পনা ঢেলে সাজানো হবে।

২.৬.৩ নগরে গণপরিবহন ব্যবস্থা উন্নততর করা ও ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহার কমিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ করাহবে।

২.৬.৪ যানজট দূর করতে মোটর সাইকেল ও সাইকেলের জন্য পৃথক লেন। প্রতিটি বাহনের জন্য যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য আইন নির্ধারণ ও তা মান্য করার ক্ষেত্রে কঠোর নীতি অবলম্বন করা হবে।

২.৬.৫ সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণগুলোকে চিহ্নিত করে তা রোধ করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে। গণপরিবহনকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে, বাসের প্রতিযোগিতা রোধে ট্রিপভিত্তিক ব্যবস্থা বাতিল, টার্মিনালগুলোকে দখলদার ও মাস্তান চাঁদাবাজ মুক্ত করে শ্রমিকরা এখন যে দখলদারিত্বের কবলে আছেন তা থেকে তাদের মুক্ত করতে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

২.৭.১ প্রতিটি নাগরিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য স্বল্পমূল্যে নিরাপদ জ্বালানির নিশ্চয়তা তৈরি করা হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির পাইলট প্রজেক্ট চালু করা হবে, প্রবাসী বাংলাদেশী মেধাবী ইঞ্জিনিয়ারদের দেশে ফেরত এনে পাইলট প্রজেক্ট শুরু করা হবে। প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ঋনের ব্যবস্থা করা হবে।

২.৭.২ পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে যেনো এই সেক্টরে কমপক্ষে ১০ লাখ নতুন চাকুরী সৃষ্টি হয়। প্রতিটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবায়নযোগ্য ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি বিষয়ে কয়েকটা কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

২.৭.৩ নতুন হাসপাতাল, নতুন স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি যে কোন নতুন অবকাঠামোকে যেনো নবায়নযোগ্য জ্বালানি উপযোগী করা হয় সে বিষয়ে উৎসাহ আর উদ্যোগ নিতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট রাখা হবে। দেশি গবেষকদের উৎসাহ দেওয়া হবে বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য নিরাপদ জ্বালানি গবেষণার জন্য।

২.৭.৪ সুন্দরবন ধ্বংসকারী রামপাল প্রকল্প বাতিল করা হবে, রূপপুর পারমাণবিক প্রকল্প বাতিল করে সেখানে বিস্তৃত এলাকায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। পারমানবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র আর কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রকে সীমিত করে ফেলা হবে, যদি সম্ভব হয় তবে প্রকল্প বন্ধ করে দিতে হবে।

২.৭.৫ জলবায়ু পরিবর্তন আর এর ভয়াবহতার ফলে বাংলাদেশের উপর যে প্রতিক্রিয়া হবে সেটার জন্য দেশবাসীকে জানানোর উদ্যোগ নেয়া হবে, সারা বিশ্বে বাংলাদেশ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই সচেতনার জন্য প্রচারাভিযান গড়ে তোলা হবে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২.৮.১ ঘরে-বাইরে-কর্মস্থলে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সচেতনতাকে জনশিক্ষায় অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। সম্পত্তির অধিকার সহ সকল আইনী দিক থেকে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিত করা হবে।

২.৮.২ সংসদে নারী আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে। সকল সংরক্ষিত নারী আসনে সরাসরি ভোটের ব্যবস্থা করা হবে। স্থানীয় সরকারেও ওয়ার্ড সদস্য নির্বাচনে একজন পুরুষ ও একজন নারী প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার বিধান যুক্ত করা হবে।

২.৮.৩ নারী শ্রমকে জাতীয় অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে গণ্য করে কর্মজীবী নারীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা শিল্পকারখানা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বাধ্যতামূলক করা হবে।

২.৮.৪ নারীর অপ্রাতিষ্ঠানিক ও গার্হস্থ্য শ্রমকে উৎপাদনশীল শ্রম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে তার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। গার্হস্থ্য কাজে নিয়োজিত শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হবে।

২.৮.৫ নারীর সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস সর্বত্র কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৮.৬ নারী-পুরুষ এর বাইরে অন্যান্য লিঙ্গীয় পরিচয়ের মানুষের মর্যাদা ও অধিকারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রত্যেক নাগরিকের রজীবনধারনের নিজস্ব স্বাধীনতা সমুন্নত রাখা হবে।

২.৯.১ পরিবেশ সুরক্ষাকে অন্যতম অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা কারখানা যেন পরিবেশ বিনাশী না হয়, তা নিশ্চিত করা হবে। পরিবেশ রক্ষায় উদ্ভাবনী প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করা হবে। নদী-হ্রদ-বিলসহ জলাভূমি ও উন্মুক্ত পরিসরগুলোকে রক্ষা করা হবে।

২.৯.২ নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। নদীকে দখল-দূষণ মুক্ত করা অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচিত হবে।

২.৯.২ বন ধ্বংস, বন দখল, পাহাড় কাটার বিরুদ্ধে আইন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জীববৈচিত্র রক্ষায় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সমুদ্রের পরিবেশ ও সামুদ্রিক সম্পদ রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নগরেও পশু-পাখি ও প্রাণীদের দুর্দশা রোধে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

২.৯.৩ পরিবেশ আদালত গঠন করা হবে যেখানে সংক্ষুব্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সরাসরি মামলা করতে পারবেন।

২.৯.৫ পলিথিন ও প্লাস্টিক ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হবে। পাটের তৈরি ব্যাগ ও পাটজাত দ্রব্য ব্যবহারে উৎসাহিত করার মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব পাটের সুদিন ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২.১০.১ ধনী ও সম্পদশালীদের কাছ থেকে যথাযথ আয়কর আদায় করতে হবে। সেটাকে শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ জনকল্যাণমূলক সেবা খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করা হবে।

২.১০.২ মোবাইল ও ইন্টারনেট ডাটার দাম আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে কমিয়ে আনা হবে।

২.১০.৩ তরুণ সমাজকে মাদকের ভয়াবহ বিপদের হাত থেকে মুক্ত করা হবে। মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরকে একদিকে রাজনৈতিক চাপ ও অন্যদিকে আমলাতান্ত্রিকতা মুক্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে, অন্যদিকে সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে নাগরিকদের অংশগ্রহণ ও তদারকি নিশ্চিত করা হবে। মাদক বাণিজ্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তথ্য, কেনাবেচার স্থানগুলোকে চিহ্নিত করা, মাদক নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ কিংবা ব্যবসার সাথে যোগাসাজস প্রমাণিত হলে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমকে উৎসাহ দেয়ার মাধ্যমে দেশকে মাদকমুক্ত করা হবে। ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু না করে বাণিজ্যটাকেই উচ্ছেদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২.১০.৪ কোটা ব্যবস্থার যৌক্তিক সংস্কার করা হবে। আদিবাসী-প্রতিবন্ধী-নারীর জন্য প্রয়োজনীয় চাকুরি ও অন্যান্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু উত্তরাধিকার সূত্রে বংশানুক্রমিকভাবে কোন কোটা বরাদ্দ হবে না। চাকুরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছরে উন্নীত করা হবে।

২.১০.৫ সমস্ত ধর্মের মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্ম পালনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হবে। সাম্প্রদায়িক হামলা নিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত হামলা রোধে ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যক্তিদের যথাযথ জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন ও যোগসাজশ প্রমাণিত হলে শাস্তি প্রদান করা হবে।

২.১০.৬ বাড়ি ভাড়াকে যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে যথাযথ আইন প্রণয়ন করা হবে।

২.১০.৭ শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যে বহুতল বাসভবন ও গ্যাস-বিদ্যুৎ-পানির সেবার সরবরাহ ও মানসম্পন্ন জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করা হবে।

২.১০. ৮ শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য সড়ক, ঘড়-বাড়ি, স্টেশনসহ সর্বত্র বিশেষ উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে।

২.১০.৯ নাগরিক প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রীয় তদারকি কমিটি তৈরি করা হবে, যারা নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সর্বোচ্চ বিক্রয় মূল্য, মুনাফার হার এবং মান নির্ধারণ করবে।

২.১০.১০ ছাত্র সংসদগুলোকে কার্যকর করা হবে। মাফিয়া নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করে সর্বত্র গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন ও সংগঠনগুলোর বিকাশ উৎসাহিত করা হবে।

২.১১ সরকারী তোষণ নয়, বরং মুক্তমতের চর্চা হবে শিল্প, সংস্কৃতির বিকাশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার মূলনীতি। স্বাধীন একটি পরিষদ প্রতিবছর প্রকাশিত মানসম্মত গ্রন্থসমূহ রাষ্ট্রীয় পাঠাগারগুলোতে ক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। চলচ্চিত্র শিল্পের বাধামুক্ত বিকাশ ঘটাবার জন্য এই শিল্পকে আমলাতান্ত্রিকতা মুক্ত করে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিষদ করা হবে। অভিনয়, সঙ্গীত, চিত্রকলাসহ সৃজনশীল সকল শিল্পমাধ্যমে রাষ্ট্র পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

২.১২ স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি হবে বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির অন্যতম স্তম্ভ। সকল রাষ্ট্রের সাথে সমমর্যাদা ও জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে সম্পর্ক স্থাপন করা হবে। আগ্রাসী শক্তির মোকাবেলায় আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক জোট গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিদ্যমান জোটসমূহকে শক্তিশালী করা হবে।

বন্ধুগণ,

বাংলাদেশ এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল এক সত্যিকার গণযুদ্ধ। যেখানে অংশ নিয়েছেন দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ আপামর জনসাধারণ। এটা কোন দলের সম্পত্তি নয়, হতে পারে না। এই লড়াই ছিল বাংলাদেশের জনগণের লড়াই, তারাই এর উত্তরাধিকার বহন করেন। একটা ন্যায়ভিত্তিক, সমতামুখী, মর্যাদাসম্পন্ন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল তার বিপরীতে রাষ্ট্রকে পরিচালনার ফলেই আজ ভয়ের রাজত্ব তৈরি হয়েছে। বাংলাদেশের সামনে যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান তার মোকাবেলায় রাষ্ট্রকে পুনঃসজ্জায় এক ব্যাপক রাজনৈতিক ঐক্য প্রয়োজন। প্রয়োজন সংঘাত-সংকট মোকাবেলায় এক নতুন সামাজিক-রাজনৈতিক চুক্তি। বাংলাদেশের ইতিহাস নির্ধারিত পথে মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারকে ভিত্তি করেই যা তৈরি হতে পারে। সেই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমাদের এমন একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে যেখানে একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গড়ে উঠবে যাতে সকল দলের অংশীদারিত্ব ও অংশগ্রহণ থাকবে, রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের মতামতই হবে নির্ণায়ক শক্তি, জনগণের সকল অংশের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে ও রাষ্ট্রে তাদের হিস্যা নিশ্চিত হবে। বহু মতের, বহু পথের স্বকীয়তা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি ও দলের কর্তৃত্বমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে। এরকম একটা গণতান্ত্রিক পরিসর ও প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই গড়ে উঠতে পারে একটা ভয়মুক্ত বাংলাদেশ, নিশ্চিত হতে পারে সকলের জন্য উন্নয়নের মাধ্যমে একটা সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেও মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষার সেই রাষ্ট্র গঠনের লড়াইয়ের অংশ মনে করি।